লীডারশীপ

(রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে বহুমাত্রিক শিক্ষা)

মুজাহিদ রাসেল

শারঈ সম্পাদনা
মুফতি আবদুল্লাহ জোবায়ের

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

প্রারম্ভ ৯

রাসূলের পূর্বে আরব নেতৃত্বের অবস্থা ১৪

রাসূলের ট্রেইনিং প্রসেস..... ১৭

মেষ পরিচালনা যখন নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ ২৩

আদর্শ নেতার পাঁচ গুণ ৩২

কার্যকর নেতার পাঁচটি লিডারশীপ কোড..... ৪২

ইসলামি মডেলে নেতার গুণ ৪৯

Transformational Leadership এবং
সমাজ পরিবর্তনের প্রফেটিক স্টেপ ৫৫

ভিশনারি লিডার হিসেবে রাসূল..... ৬২

আদর্শ নেতার অসাধারণ কিছু গুণাগুণ ৭২

যোগ্য নেতার যোগ্য অনুসারী সৃষ্টি ১৪৮

অনুসারীদের জন্য দরদি নেতার হৃদয়ের কান্না..... ১৬০

নেতার প্রতি অনুসারীদের ভালোবাসার নমুনা..... ১৬৩

অনুসারীদের মনস্তত্ত্ব পড়তে জানা..... ১৬৯

অমুসলিমদের চোখে বিশ্বনেতা মুস্তফা..... ১৭৩

পরিশেষ ১৯২

BIBLIOGRAPHY ১৯৪

প্রারম্ভ

মানব ইতিহাসে নেতৃত্বের ধারণাটি অতীব পুরোনো। যদিও প্রাচীনকালে মানুষ 'নেতৃত্ব' নামক টার্মটির সাথে পরিচিত ছিল না, কিন্তু দেখা যেত তারাও একজনকে সামনে এগিয়ে দিয়ে শিকারে বের হচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম থেকে শুরু করে আজ অবধি তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে বেশুমার নেতার জন্ম হয়েছে। সৃষ্টি এবং সমাজের প্রয়োজনই নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল থেকে শুরু করে মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম গাযালি, ইবনু খালদুনের মতো অসংখ্য লেখকদের চিন্তাজাত তত্ত্বগুলো থেকে আজকের আধুনিক লিডারশীপের ভিত রচিত হয়েছে।

বর্তমানকালে লিডারশীপ ধারণাকে পুঁজি করে বইয়ের জোয়ার বইছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আজ পর্যন্ত লিডারশীপের ওপর ৯০,০০০ বই রচিত হয়েছে। 'নেতৃত্ব' নিয়ে প্রচুর থিসিস-এন্টি থিসিস-সিনথেসিস হয়েছে। সভ্যতা এগিয়ে গেছে। আজ আমরা মানব ইতিহাসের যে জায়গায় এসে পূর্বের বিষয়গুলোর ওপর অবলোকন করছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি গবেষণার বিশাল পাহাড়। 'জ্ঞান মুসলিমদের হারানো সম্পদ'—রাসূলের এমন নির্দেশনা আমাদের সকল রকম চিন্তা, তত্ত্ব এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে। একইসাথে মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণজনক বিষয়গুলোকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে একটা ইনক্লুসিভ মাইন্ডসেট তৈরি করে।

আবার অনেক সময় এমন হয়, গলায় চশমা ঝুলিয়ে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে চশমা খোঁজার মতো অবস্থাও হয়। আধুনিক তত্ত্ব, স্মার্ট টারমিনোলজি, আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা আমাদের মোহিত করে। খানিকটা গভীরে গেলে দেখা যায়, আমাদের রাসূল অনেক আগেই বিষয়গুলোর ইঙ্গিত, নির্দেশনা, কোনো কোনো

ক্ষেত্রে ট্রেইনিং পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজকালকার যুগে চলার পথে আমরা সেগুলোকে পাথেয় হিসেবে নিতে পারিনি। যথাযথ প্রেজেন্টেইশান এবং ব্র্যান্ডিং এর অভাবে আমরা রাসূলের মুক্তোগুলোকে অযত্নে রেখে চলে যাই।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক লোকের বাবা মারা যাওয়ার সময় ইঙ্গিত করে যায় তার ঘরের নিচে কিছু একটা রেখে গিয়েছেন। লোকটি রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে স্বর্ণভর্তি কলস পায়। রাতেই এলাকা ত্যাগ করে সে নদী পার হওয়ার মনস্থির করে। পথে দেখে একটা ব্যাগভর্তি কী যেন পড়ে আছে। লোকটি খুলে দেখে, লণ্ঠনের আলোয় ভেতরের জিনিসটি জ্বলজ্বল করছে। স্বর্ণের চিন্তায় বিভোর লোকটির মাথায় হীরার চিন্তা ঘুরপাক খেল। সে ব্যাগভর্তি হীরার আশা এবং লোভে পড়ে যায়। চলার পথে কলসের ভারের কারণে নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না—এ ভয়ে সে রাস্তার পাশের জমিনে তা ফেলে রেখেই আপন চিন্তায় তৈরি হীরার ব্যাগ নিয়ে খুশি মনে হাঁটতে থাকে। নদী পার হয়ে পরদিন সে ব্যাগটি সওদাগরের কাছে নিয়ে জানতে পারে তা হীরা ছিল না, ছিল কিছু কাচের টুকরা।

আমাদের অবস্থা অনেকটা সেরকম। মনের অজান্তেই নিজের সম্পদগুলোকে বেওয়ারিশ-অযত্ন-অবহেলায় ধূলিমলিন করে অপরের কাছে দামি সম্পদ খুঁজে বেড়াচ্ছি। 'মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই রাসূলের রয়েছে বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা'—এটা শুধু কথার কথা কোনো বুলি নয়, নয় কোনো ধার্মিক ব্যক্তির বদ্ধ চিন্তার ফল, কিংবা ওয়াজের মাঠ কাঁপানোর জন্য কোনো ওয়ায়েজের নিয়মমাফিক চিৎকার। বরং যে-কেউ রাসূলের পুরো জীবনী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে, চিন্তাশীল মস্তিষ্কে চোখ বুলালেই এমন উপসংহারে পৌঁছাবেন। 'নেতৃত্ব'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূল আমাদের বঞ্চিত রাখেননি। এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা এবং বাস্তবভিত্তিক ট্রেইনিং সীরাতের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। যেমন ধরুন, রাসূল বলেছেন,

'সফরে তিনজন থাকলে একজনকে নেতা বানাও।'

যদিও আল্লাহর রাসূল এখানে দৈহিক সফরের কথা বলেছেন, তবে যে-কোনো কাজ, প্রচেষ্টাকে এটার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কোনো একটা প্রজেক্টে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ কাজ করে বলে সেটাও মানসিক সফর হিসেবে ধরা যেতে পারে।

অতএব, রাসূল এখানে সুস্পষ্টভাবে নেতৃত্বের একটা কাঠামো, প্রয়োজনীয়তা

নিয়ে কথা বলেছেন। এভাবে সীরাত এবং হাদিসের মধ্য থেকে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রাসূল নেতৃত্বের সকল ডাইমেনশানে নিজেকে মুসলিমদের কাছে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

নেতৃত্বের রকমভেদ আলোচনা করতে গিয়ে লিডারশীপ গুরু 'জন এডেয়ার' তিনটি শ্রেণিবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। পদবি বা অবস্থান অনুসারে। এটা সাধারণত উচ্চ পদ থেকে নিম্ন পদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা।

২। জ্ঞানের ভিত্তিতে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে পারদর্শিতার ভিত্তিতে।

৩। ক্যারিশমা। অর্থাৎ অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে। সাধারণত যে-কোনো ক্ষেত্রে তারা তাদের প্রতিভা প্রকাশ করে থাকে।

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা যে-কোনো এক প্রকারভেদে নিজেকে আবিষ্কার করে। যেমন ধরুন, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, CEO, প্রেসিডেন্ট—এরা সাধারণত প্রথম শ্রেণির নেতৃত্বের প্রকারভেদে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রকারভেদে যেসকল নেতাদের ফেলা হয়, তারা সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান এবং পারদর্শিতার জন্য নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে। যেমন ধরুন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর, ডাক্তার ইত্যাদি। তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে আছে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের লিডার, কমিউনিটি লিডার কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলেব্রিটি। তারা তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভা দেখিয়ে মানুষকে নিজের সাথে মার্চ করতে অনুপ্রাণিত করে।

রাসূলের জীবনীর দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ করি, তাহলে দেখব, তিনি তিনটি ক্ষেত্রেই নিজেকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে গেছেন। অবস্থান অনুসারে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। উম্মাহ কনসেপ্টে তিনি পদের সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন আছেন। জ্ঞানে এবং প্রজ্ঞায়ও তিনি নেতৃত্বের শিখরে অবস্থান করছেন। বিশ্বাসের মূলনীতি বলুন আর জীবন চলার দার্শনিক তত্ত্বই বলুন, রাসূলের নির্দেশনাকেই আমরা চূড়ান্ত হিসেবে মানি এবং বিশ্বাস করি। সাথে সাথে তাঁর ক্যারিশম্যাটিক ক্ষমতা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। তাঁর মুখনিঃসৃত মুক্তোদানা মানুষকে অনুপ্রাণিত এবং আলোড়িত করত।

মানুষ সুসময় এবং বিপদ—দুই ক্ষেত্রেই নেতাকে চিনতে পারে। ভালো সময়ে নেতার সততা এবং বিপদে নেতার নেতৃত্বের শক্তি মানুষের চোখে প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

আব্রাহাম লিংকন বলেছেন,

'প্রায় সব মানুষই প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে, কিন্তু আপনি যদি একজন মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করতে চান তবে তাকে ক্ষমতা দিন।'

অপরদিকে একটা কথা প্রচলিত আছে,

'নেতৃত্ব হচ্ছে টি ব্যাগের মতো। গরম পানিতে না দিলে এটার গুণাগুণ বোঝা যায় না। তেমনি বিপদ, চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতা ব্যতীত নেতৃত্বকে উপলব্ধি করা যায় না।'

মক্কা ছিল মুসলিমদের জন্য জ্বলন্ত উনুনের ন্যায়। আর মদীনার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল চ্যালেঞ্জে ভরপুর। ভেতর এবং বাইরের শক্তির সম্মিলিত চাপ প্রতিটি মুহূর্তে মুসলিমদের ব্যাকুল রাখত। এ অবস্থায় রাসূল তাঁর নেতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখিয়েছেন—যা আমরা এই বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় খুঁজে বেড়াব। মুসলিমদের বিজয় ডঙ্কা যখন বেজেছিল, চারদিকে মুসলিমদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় রাসূল কোনো স্বেচ্ছাচারী সুবিধাভোগী নেতার মতো নিজের পকেট ভারী করায় ব্যস্ত থাকেননি; বরং বিনয়, রবের প্রতি একাগ্রতা এবং অনুসারী-সহচরদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

ডেল কার্ণেগি তার 'How to win friends and influence people' বইতে মেকিয়াভেলী স্টাইলে যে-কোনো উপায়ে ফলাফল ঘরে তুলতে হবে, মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে, রাসূল এই পথে যাননি। কিংবা ধূর্ত শিয়ালের মতো কার্যসিদ্ধির পথ খোঁজার কথাও বলেননি। বরং সম্মানজনকভাবে মানুষকে ভালোবেসে, কাছে টেনে কিভাবে তাদেরকে প্রভাবিত এবং মোহিত করা যায়—তার একটা পথ বাতলে দিতে চেয়েছেন। মোটকথা, অন্তরে সততার সাথে সুচারুভাবে কাজ করে মানুষের মনের রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

চিন্তাশীলতা-তড়িৎ কার্যকরী সিদ্ধান্ত, কোমলতা-কঠোরতা, ইনসাফ-ক্ষমা, নেতাসুলভ সিদ্ধান্ত, পরামর্শগ্রহণ—সবকিছুর মিশেলে এমন এক উদাহরণ

তিনি দাঁড় করিয়েছেন, যা মানব ইতিহাসে অনন্য, একক। তাই তো এখনো তাঁর লিডারশীপ নিয়ে গবেষণা, আলোচনা এবং পর্যালোচনা চলে।

লেখক রিচার্ড গ্যাব্রিয়েলের ভাষায় :

> *'His strategic thinking and leadership skills continue to be studied and admired by military historians today.'*

রাসূলের পূর্বে আরব নেতৃত্বের অবস্থা

ইসলামের উত্থানের আগে, আরব জনসংখ্যা দক্ষিণে ইয়েমেন থেকে উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য সংলগ্ন শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত একটি বিস্তৃত এবং চ্যালেঞ্জিং মরুভূমিতে বসবাস করত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মক্কা, ইয়াসরিব, তায়েফ এবং হেজাজের মতো এলাকাগুলোকে ঘিরে এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ ছিল। পাশাপাশি সেগুলো সেই যুগে আরবের গুরুত্বপূর্ণ নগর-কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

আরবরা মূলত গোত্রীয় প্রধানদের কর্তৃত্ব দ্বারা শাসিত হতো। একটি গোত্রীয় প্রধানের দায়িত্ব ছিল গোত্রের সদস্যদের রক্ষা করা, এমনকি অন্যায়ের ক্ষেত্রেও। গোত্রীয় আনুগত্য নৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে একটি আনুষ্ঠানিক সরকার, আইনি ব্যবস্থা, বা স্পষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার ভিত কখনোই তৈরি হয়নি। কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্বের অধীন না থাকায় তাদের মধ্যে সদা বিশৃঙ্খলা দেখা যেত। ফলস্বরূপ, এই গোত্রগুলো আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বিষয়গুলিতে তীব্র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে তাদের শক্তি ব্যয় করত। উদাহরণস্বরূপ, ঘোড়ার দৌড়ে প্রতিযোগিতা করা বা উট দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিংবা ঘোড়াকে আগে পানি খাওয়ানোর মতো তুচ্ছ ঘটনাও অনেক বড় বড় দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল।

এ সকল যুদ্ধ তাদের গোত্রীয় নেতাদের ক্ষমতা এবং ঘোড়সওয়ার প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল তাদের নিজ নিজ গোত্রের জন্য সম্মান এবং প্রতিপত্তি সুরক্ষিত করা। আখেরে, এ সকল সংঘাত আরব সমাজ এবং নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষরা সমাজে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করত, নারীরা ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। পুরুষদের সীমাহীন সংখ্যক নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না, স্ত্রীরা সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তীদের কাছে যেত। দুঃখজনকভাবে, কিছু নবজাতক মেয়েশিশুকে হত্যার শিকার হতে হয়েছিল। কিছু কিছু মহিলা বেঁচে থাকার জন্য পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ার উপায় হিসেবে বাড়িতে লাল পতাকা ঝুলাত। উপরন্তু, আরব জনসংখ্যার প্রচলিত অভ্যাসের মধ্যে ছিল মদ খাওয়া, জুয়া এবং ক্রীতদাসদের ব্যবসা।

প্রাক-ইসলামি আরব জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মূর্তিপূজা করত। জিন্দিক, সাবেয়ী, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং একেশ্বরবাদী (হজরত ইবরাহিমের অনুসারী) বিশ্বাস লালন করত—এমনও কিছু লোক ছিল।

আরব অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে পশুপালন এবং যুদ্ধের ওপর নির্ভর করত। কৃষি এবং উৎপাদনের ওপর সীমিত নির্ভরতা ছিল। কিছু লোক ইয়েমেন, শাম (সিরিয়া), বাহরাইন এবং ইরাকের মতো অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। শামের কাছে হেজাজ ও নজদে 'দুমাতুল-জান্দাল মেলা' এবং তায়েফের কাছে 'উকাজ মেলা' আয়োজন করা হতো। মক্কা একটি ট্রেডিং হাব হিসেবে কাজ করত, এর জনসংখ্যা প্রধানত বণিক এবং ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

সুদি কায়কারবার মূলধন বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। অত্যধিক সুদের হার ঋণদাতাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে, আর ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক সংগ্রামকে বাড়িয়ে দেয়; যার ফলে সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণমনা, বস্তুবাদী এবং আবেগপ্রবণ। মদপান এবং জুয়া খেলেই তাদের সময় কাটত। অন্তর্দ্বন্দ্ব, খুনোখুনি এবং রক্তের খেলার কথা তো আগেই বললাম। তাদের জাহিলি যুগের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে এক লেখক লিখেছেন,

'আরবদের কাছে নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড বা নীতি ছিল না। উপজাতীয় ঐতিহ্যকে তারা মনেপ্রাণে ধারণ করত। নৈতিকতাবোধ ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভালো-খারাপ মাপার জন্য পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডকেই মানদণ্ড বিবেচনা করত।'

আরবের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে নেতাদের তিন ভাগে ভাগ করা

যায়।

প্রথমত, গোত্রীয় নেতারা—যারা তাদের পিতা-মাতা এবং দাদা-দাদির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের অবস্থান পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের নেতা—যারা ছোটখাটো যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

সবশেষে, পুঁজির মালিক—যারা শোষণের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়তেন।

মোটাদাগে বিচার করলে, তাদের নেতৃত্বের পদ্ধতিগুলিকে অনৈতিক বলে মনে করা হতো; কারণ তারা দাস, নারী, প্রতিবেশী এবং দরিদ্র-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সামান্যই সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

উপরন্তু, এই নেতারা আরবের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে তাদের গোত্রীয় ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সংকীর্ণতা প্রদর্শন করছিলেন। তাদের নেতৃত্বের শূন্যতা স্পষ্ট প্রকাশিত ছিল। এমন নেতৃত্বের অভাব তারা অনুভব করছিল, যারা সামাজিক রীতিনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

পৃথিবীতে রাসূলের আবির্ভাব মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি কোনো গোত্রীয় বা জাতীয়তার মিশন নিয়ে আসেননি। তিনি চাইলেই আরব জাতীয়তাবাদের ডাক তুলে সবাইকে এক শামিয়ানার নিচে আনার প্রচেষ্টা চালাতে পারতেন এবং নিজে তাদের নেতা বনে যেতে পারতেন। তাঁর বংশের সে আভিজাত্যতা এবং ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সে গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মানবতাবাদের বুলি আওড়িয়ে কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তির কাণ্ডারি হয়েও তিনি তাদের নেতা হতে পারতেন। সেই বিশ্বাসযোগ্যতা তাঁর ছিল। সেসব কিছুতে না গিয়ে রাসূল মুহাম্মাদ তাওহিদের পতাকা হাতে নিয়েছিলেন এবং পুরো বিশ্বের মানুষকে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। মদীনায় এমন এক সমাজব্যবস্থা দাঁড় করান এবং তাদের মধ্যে একাত্মতার এক সুষম কন্সেপ্ট প্রতিষ্ঠিত করেন—যা পুরো বিশ্বের মানুষকেও এক ছাউনির নিচে নিয়ে এসেছে। 'উম্মাহ', এ এমন এক আইডিয়া—যার কারণে আপনি বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের হোন না কেন, এক কালিমা গ্রহণ করে আপনি এই দলে শামিল হতে পারছেন। এই উম্মাহর এক কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিস্টেম থাকবে। রাসূল যার সুপ্রিম নেতা। একটা সেন্ট্রাল নেতৃত্বব্যবস্থার মধ্যে সবকিছু থাকবে। আরবদের পুরোনো নেতৃত্বব্যবস্থা ভেঙে এ এক নতুন দিগন্তের সূচনা।

রাসূলের ট্রেইনিং প্রসেস

মানুষের চরিত্রে দুধরনের গুণাগুণ দেখা যায়, একটি জন্মগত অপরটি অর্জিত। সৌন্দর্য, শক্তি, কথা বলার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, বোঝানোর এবং বোঝার ক্ষমতা, অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ—এগুলোকে বলা যায় জন্মগত গুণ। অপরদিকে জ্ঞান, ধৈর্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, উদারতা, সাহসিকতা—এগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্জিত। সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করা যায়। নেতৃত্ব এমন একটি বিষয়, যা অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত এবং অর্জিত গুণগুলোর যোগফলে গড়ে উঠে। যেমন ধরুন, একজনের এপিয়ারেন্সও অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের বাড়তি সুবিধা দেয়। বক্তব্যের ক্ষমতা, বুঝা ও বোঝানোর ক্ষমতা নেতৃত্বের শক্তিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

নেতৃত্বের গুণাবলির ক্ষেত্রে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ১% লোক সহজাত নেতৃত্বের গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ১% লোক সহজাতভাবেই অনুসারী হয়ে থাকে। বাকি ৯৮% লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যথার্থ প্রশিক্ষণ এবং পরিচর্যা পেলে তিনি আস্তে আস্তে নেতা হয়ে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। নেতৃত্ব সম্পর্কিত লেখিকা বিনা ব্রাউন বলেন, 'কিছু মানুষ অনন্যসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তাদের মহান নেতা বানায়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষকে এর ওপর টিকে থাকার জন্য ক্রমাগত অনুশীলন করে যেতে হয়।'[১]

বিশ্ব ইতিহাসে কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করার সুযোগ আছে। প্রত্যেক নবিই মূলত নেতৃত্বের সহজাত

[১] Follow my lead (virgin blue magazine, march, 2011), p. 119

গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তাঁদের নেতৃত্বের অন্যান্য অংশগুলো পোক্তভাবে তৈরি হয়। একজন নেতার যে গুণগুলো সুবাস হয়ে ছড়ায়, আল্লাহ সেগুলো তাঁদের মধ্যে বিকশিত করে দেন এবং মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্র তৈরি করেন। অন্যান্য নবি-রাসূলদের ক্ষেত্রে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের কারণে মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রতি আকৃষ্টতা তৈরি হয়। রাসূল মানুষকে যে তাঁর প্রতি, তাঁর মেসেজের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, তার কারণ মূলত ছিল চল্লিশ বছরের চারিত্রিক ভিত্তি ও সৌন্দর্য। সীরাতে এসেছে,

'...অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় যৌবনে পদার্পণ করলেন যে, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত ও দেখাশোনা করতেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত নোংরামি থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কারণ আল্লাহর তাআলার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে নবুওয়ত, রিসালাত এবং সর্বপ্রকার ইজ্জত ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করবেন। এভাবে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। চাল-চলন ও সুন্দর চরিত্র, বংশ মর্যাদা, সহনশীলতা ও ধৈর্য, সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন। অশ্লীলতা এবং নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে এত বেশি দূরে থাকেন যে, তাঁর নাম "আমিন" হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।'[২]

যে রাসূল এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তিনি যদি কখনো মূর্তিপূজার মতো খোদাদ্রোহী কাজে কোনো না কোনো সময় যুক্ত থাকতেন, তাহলে মানুষ কথা বলার সুযোগ পেত। তাই আল্লাহ ছোটবেলা থেকেই এসকল কাজ থেকে রাসূল ﷺ-কে বিরত রাখেন।

হজরত আলি থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কি কোনো সময় মূর্তির পূজা করেছেন?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'না।'

তিনি এ-ও বললেন, 'আমি সব সময় এগুলোকে কুফর মনে করতাম। যদিও সেই সময় আমার কিতাব ও ঈমানের জ্ঞান ছিল না।' (আবু নুয়াইম ও ইবনু আসাকির)

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, হজরত খাদিজার একজন প্রতিবেশী বর্ণনা করেন, 'আমি নবি কারীম ﷺ কর্তৃক হজরত খাদিজাকে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর কসম! আমি কখনো লাতের পূজা করব না। আল্লাহর কসম! আমি

[২] সীরাতে ইবনু হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২

কখনো উযযার পূজা করব না।"' হজরত যায়িদ ইবনু হারিসা ﵁ বলেন, 'জাহিলি যুগে যখন মুশরিকরা কাবা শরিফ তওয়াফ করত, তখন আসাফ ও নাইলা মূর্তিকে স্পর্শ করত। একবার আমি নবি কারীম ﷺ-এর সাথে বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করি। যখন ওই মূর্তিগুলোর নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি তা স্পর্শ করলাম। নবি কারীম ﷺ আমাকে এগুলো ছুঁতে নিষেধ করেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, দেখি তো ছুঁলে কী হয়? এ ভেবে আমি দ্বিতীয় বার স্পর্শ করলাম। এবারে তিনি একটু রূঢ়ভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি?"' যায়িদ বলেন, 'আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কোনোদিন এগুলো স্পর্শ করিনি। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালাত দানে ধন্য করলেন। এবং তাঁর প্রতি স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করলেন।

একবার কুরাইশরা তাঁর সামনে কিছু খাদ্য রাখল। ওই মজলিসে যায়িদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইলও ছিলেন। তিনি খাদ্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যায়িদও অস্বীকার করলেন। এবং বললেন, 'আমি দেবদেবীর নামে জবেহকৃত জন্তু এবং দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত বস্তু আহার করি না। কেবল ওই বস্তুই খেয়ে থাকি, যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।'[৩]

শুধু মূর্তিপূজাই নয়, বরং জাহিলিয়াতের সকল সংস্কৃতিকেই তিনি শৈশব থেকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন। দু-এক বার যদিও কিছুটা মানবিক দুর্বলতার কারণে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজ কুদরতি শক্তিবলে তাঁকে রক্ষা করেন। তিনি যে বিশ্বনবি, বিশ্বনেতা হবেন, তাই এমন পদস্খলন কি তাঁর শোভা পায়! খোদায়ী প্রশিক্ষণের আওতায় তা তো একদমই মানায় না।

হজরত আলি ﵁ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কথা বলতে শুনেছি যে, "কোনোদিন জাহিলিয়াতের কোনো সংস্কৃতির প্রতি আমার কোনো খেয়াল ছিল না। কেবল দুই বার মাত্র এ খেয়াল মনে জেগেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং নিরাপদ রেখেছেন। একরাতে আমি আমার বকরি চরানোর জন্য এক রাখালকে বললাম, 'আজ রাতে তোমরা আমার বকরিগুলোকে দেখে রাখবে। আমি মক্কায় গিয়ে কিছু কিচ্ছা-কাহিনি শুনে আসি।' মক্কায় প্রবেশ করে আমি এক বাড়িতে গান-বাজনার আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হচ্ছে? জানা গেল, অমুকের বিবাহ

[৩] ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৮

হচ্ছে। আমি বসেই ছিলাম। আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আল্লাহ আমার কর্ণদ্বয়ে মোহর লাগিয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়েই থাকলাম। এমনকি সকালের রোদ আমাকে জাগিয়ে দিলো।

ঘুম থেকে উঠে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসি। সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করল, 'কী কী দেখে এলে?' আমি বললাম, 'কিছুই না।'"

এরপর তিনি নিজের ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা বর্ণনা করে শোনালেন। দ্বিতীয় একরাতে তিনি একই ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একই অবস্থা সৃষ্টি হলো। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! এরপর আর কোনোদিন আমার অন্তরে এরূপ কোনো খেয়াল হয়নি। তারপর তো আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর নবুওয়ত দানে ভূষিত করলেন।"'[৪]

সহিহ বুখারি এবং মুসলিমে আছে, কাবাঘর নির্মাণের সময় নবি ﷺ-ও পাথর বহনের কাজ করেছেন। তাঁর চাচা হজরত আব্বাস বললেন, 'ব্যাটা, লুঙ্গি খুলে ঘাড়ে দাও যাতে পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারো।' তিনি চাচার হুকুম পালন করতে গিয়ে লুঙ্গি খোলার সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর তাঁকে আর কখনো উলঙ্গ দেখা যায়নি।

রাসূলের ঘনিষ্ঠ সহচর হজরত আবু তোফায়েল ﷺ বলেন, ওই সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, 'হে মুহাম্মাদ, নিজ সতর সম্পর্কে সতর্ক হও।' এ গায়েবি আওয়াজই তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম আওয়াজ ছিল—যা তাঁকে শোনানো হয়।[৫]

রাসূলের চাচা আবু তালিব এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার কী অবস্থা হয়েছিল?' তিনি বললেন, 'সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তি দেখা গেল, আর তিনি বললেন, "হে মুহাম্মাদ, নিজ সতর ঢাকো।"'[৬]

এভাবে মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে যাবতীয় অশ্লীল এবং নবুওয়ত পরিপন্থি কাজ থেকে রক্ষা করে আরও উত্তম কোনো কাজের জন্য তৈরি করছিলেন। কিশোর বয়স থেকে মূর্তিপূজার সংস্কৃতি তাঁর মনে দাগ কাটে।

---

[৪] এ হাদিস মুসনাদে বাযযার এবং মুসনাদে ইসহাক ইবনু রাওয়াহ প্রমুখ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনু হাজার বলেন, এ হাদিসের সনদ মুত্তাসিল এবং হাসান। এ হাদিসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

[৫] আবু তোফায়েলের এ বর্ণনা দালাইলে আবু নুয়াইম, দালাইলে বাইহাকি এবং মুসতাদারকে হাকিমে উল্লেখ আছে। হাকিম বলেন, এ হাদিসটি সহিহ।

[৬] হাকিম বলেন, বর্ণনাটি সহিহ। ইবনু সাদ, ইবনু আদী, হাকিম সহিহাইন ও আবু নুয়াইম ইকরামা ইবনু আব্বাস ﷺ সূত্রে এটি বর্ণিত।

অন্তরের গভীর থেকে এর নির্মূল অনুভব করেন। তা ছাড়া সমাজের বিভিন্ন রকম যুদ্ধবিগ্রহ, অনাচার-অবিচার তাঁকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। যুবক বয়সে এসে কুরাইশদের অন্যান্য নীতিবাদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে নিয়ে তিনি তৈরি করেন 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘ। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিপীড়িতদের পক্ষে সোচ্চার হওয়া, সে নিপীড়িত ব্যক্তি যে-কেউ হতে পারে; কুরাইশ কিংবা বহিরাগত আগন্তুক। নবুওয়তের পরেও তিনি এ সংগঠন সম্পর্কে বলেছিলেন,

'আমি আবদুল্লাহ ইবনু জুদানের বাড়িতে এত চমৎকার এক চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম, এতে আমার অংশ লাল উটের পালের বিনিময়ে হলেও দেবো না (অর্থাৎ কোনোকিছুর বিনিময়েও আমি এ গৌরব বদল করব না)।'

তিনি আরও বলেন,

'এখনো যদি আমাকে তাতে উপস্থিত থাকতে ডাকা হয়, আমি সানন্দে তাতে সাড়া দেবো।'[৭]

এভাবে আল্লাহ সব সময় তাঁকে নেতৃত্বের কিছু প্রসেসে রেখেছেন, যা তাঁকে অনেক বেশি বিচক্ষণ, দয়ার্দ্র, সাহসী এবং কৌশলী করে তোলে। তা ছাড়া যুবক বয়সে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেও রাসূল অনেক বেশি মানুষের সংস্পর্শে আসেন। আসলে লেনদেন-মুআমালাতের কারণে মানুষের নাড়িনক্ষত্র জানা যায়। তাদের রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। এসকল অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁর নেতৃত্বের গুণকে পরিপক্বতার দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূলের প্রথম নবুওয়ত পাওয়ার ঘটনা আমরা কমবেশি সবাই জানি। হেরা পর্বতের গুহায় জিবরীল তাঁর কাছে আসেন এবং কুরআনের সূরা আলাকের প্রথমদিককার আয়াতগুলো পড়তে বললে, তিনি 'উম্মী' অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়ার দরুন অপারগতা প্রকাশ করেন।

তখন জিবরীল তাঁকে জড়িয়ে ধরলে তিনি পড়তে শুরু করেন।

এ ঘটনার পর রাসূল তড়িঘড়ি করে প্রশান্তি এবং একান্ত আস্থার জায়গা প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা ﵂-এর কাছে গেলেন। তিনি ভীষণ ভয় পেলেন। খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও!' তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। তাঁর ভয় যখন কিছুটা কেটে গেল, তখন খাদিজাকে সকল ঘটনা শোনালেন। খাদিজা ঘটনা শুনে বললেন,

---

[৭] সীরাতে ইবনু হিশাম

'আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন। অসহায়কে সাহায্য করেন। সম্বলহীনকে দান করেন। অতিথিকে মেহমানদারি করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে সহযোগিতা করেন।'

খাদিজা ﵂-এর এমন সান্ত্বনাদায়ক এবং প্রশস্তিদায়ক এ বক্তব্যগুলোই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল নবুওয়তের পূর্বযুগেও কেমন ছিলেন! আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর সেসকল গুণাগুণ—যা তাঁকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিল এবং তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। যে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে, মানব নেতৃত্বের জন্য তার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

> *'একজন মানবের সৃষ্টি হয়েছে অন্য মানবদের প্রয়োজন অনুভব করার জন্য। যদি এমন না হতো তাহলে মানব সৃষ্টির দরকার হতো না, কারণ আল্লাহর ইবাদতের জন্য তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট। মানব সৃষ্টিই তো মূলত মানবের তরে। আর একজন নেতা এই মানবকল্যাণের অদৃষ্ট প্রতিযোগিতায় সদা বিজয়ী হয়।'*

মেষ পরিচালনা যখন নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

'এক দরিদ্র মেষপালক জাতি সকলের অগোচরে সৃষ্টির প্রথম থেকে মরু প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন মহানায়ক নবিকে এমন কিছু বাণী নিয়ে তাদের কাছে পাঠানো হলো—যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। দেখো, অপরিচিতরাই বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করল, একটি ক্ষুদ্র জাতি বিশ্বের মহত্তম জাতি হলো। মাত্র এক শতাব্দীকাল পরে আরব জাতি একদিকে গ্রানাডা ও অপরদিকে দিল্লি পৌঁছাল। শৌর্য-বীর্যে, সাহসে, পরাক্রমে, দীপ্তিতে এবং জ্ঞানের গরিমার আলোকে সহসা জ্বলে উঠে বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে আরব সভ্যতা জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।'[৮]

- থমাস কার্লাইল

এই মেষচালক জাতিকে এমন একজন মহানায়ক নবি পরিচালনা শুরু করলেন, যিনি নিজেও শৈশব-কৈশোরে মেষ চড়াতেন। নবুওয়ত এমন একটি দায়িত্ব, যা আল্লাহ তাঁর স্বীয় জ্ঞানে কিছু বাছাইকৃত মানুষকে দান করেন। নবুওয়তের কঠিন দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ নবি-রাসূলদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। সম্ভবত প্রত্যেক নবিকে মেষ চালনার মতো পেশায় যুক্ত করাও এ প্রশিক্ষণেরই একটা অংশ।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

'আল্লাহ এমন কোনো নবি পাঠাননি, যিনি মেষ চড়াননি।'

বাইবেলেও আছে মূসা ﷺ, দাউদ ﷺ এবং ঈসা ﷺ মাঠে মেষ চড়াতেন।

[৮] the works of Thomas Carlyle, vol. ৩, Hero as a prophet

বাইবেল অনুযায়ী ঈসা ﷺ নিজ মুখেই বলেছেন,

'I am the good shepherd.'[৯]

তিনি আরও বলেছেন,

'I was sent only to the lost sheep of Israel.'[১০]

সকল নবির ক্ষেত্রে এই মেষচালনার বিষয়টি কেন আসল? মানবকুলকে মেষের সাথে উপমা দেয়া কি দৈবক্রমে, নাকি এটার পেছনে কোনো ডিভাইন উইজডম কাজ করছে? অনেক হাদিস বিশেষজ্ঞ রাসূল ﷺ-এর এ কথাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বুখারির বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজার সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'প্রত্যেক নবিকে নবুওয়তের পূর্বে মেষচালক তথা রাখাল হিসেবে পাঠানোর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, তাঁরা যেন পশুর পাল চালনায় দক্ষ হয়ে উঠে। যেহেতু ভবিষ্যতে তাঁরা তাদের জাতির ওপর দায়িত্বশীল হবে। এমন পরিচালনার কারণে তাঁরা ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া এবং ধৈর্যের গুণ লাভ করে। যখন পুরো পালকে একত্র করতে হয় কিংবা যখন সবগুলোকে চড়াতে নিয়ে যেতে হয়, একজন রাখালকে অবশ্যই সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। সাথে সাথে সতর্ক থাকতে হয় শিকারি জীবজন্তু থেকে। এইভাবে একজন নবি তাঁর জাতিকে ভেতর এবং বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা করার দীক্ষা গ্রহণ করে। জাতিকে পরিচালনার জন্য ধৈর্যের শিক্ষা পায়। দুর্বল লোকদেরকে দয়া ও সহানুভূতির বাগডোরে বাঁধা এবং প্রভাবশালীদের ব্যাপারে দৃঢ় থাকার প্রশিক্ষণও নবিরা এ মেষ চড়ানোর মাধ্যমে লাভ করে।'

ইবনু হাজারের এ ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য হাদিস ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যাগুলোর ওপর যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব, মরুভূমিতে এ মেষ চড়ানোর মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের অনেকগুলো দিক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে গিয়েছিল।

---

[৯] john, ১০ : ১৪

[১০] Matthew, ১৫ : ২৪